Vol. 31 | No. 1 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

চৌরপঞ্চাশিকা

Volume	31
Issue	1
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	October 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v31i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i1.1
Pages	1-37
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

চৌরপঞ্চাশিকা

সৈয়দ আলী আহসান

প্রাচীন এবং মধ্যযুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজা এবং রাজপ্রমুখদের দরবারে কবিগণ প্রেম ও রতির কাব্য অনুপম লাবণ্যময় সংস্কৃত ভাষায় পাঠ করতেন। শাণিত বাক্‌চাতুর্য, উচ্ছ্বাসের প্রবঞ্চনা, আত্যন্তিক বিনয় ও সম্ভাষণ এবং শব্দের দ্বৈতার্থ তাঁদের কাব্যের বৈশিষ্ট্য ছিল। এমনিতেই সংস্কৃত ছিল পরিশুদ্ধ এবং সুমার্জিত ভাষা—লোকমুখের অর্চনা এবং ভাষণ থেকে দূরে। তদুপরি কবিরা ছিলেন পণ্ডিত এবং রাজ-আনুকূল্যপ্রার্থী। এঁরা রাজদরবারে বিনয়নম্র বিগলিত সম্ভাষণে রাজস্তব করতেন এবং রাজাকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য পৌরাণিক অথবা শৃঙ্গার-কাব্য রচনা করতেন। সংস্কৃত শব্দের অর্থ পরিশুদ্ধ, সুমার্জিত, সুবিবেচিত এবং সুবিন্যস্ত। একটি বিশিষ্ট নিয়ম এবং শাসনকে মান্য করে সংস্কৃতের উদ্গম এবং বিকাশ। অন্যপক্ষে প্রাকৃত হচ্ছে সাধারণ মানুষের অপরিমার্জিত স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাবের ভাষা। চতুর্থ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতে সংস্কৃত ভাষা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো। পাণিনির ব্যাকরণের নিয়মের বলয়ের মধ্যে থেকে সংস্কৃত ভাষা বিভিন্ন রাজ-সভার আনুকূল্য পেয়েছিলো।

বৈদিক যুগে ঋষিদের অর্চনা এবং স্তুতি যে ভাষায় রচিত হয়েছিলো তা স্বাভাবিকভাবেই সুরক্ষিত থাকে নি। মূলভাষা এবং উচ্চারণ বহু যুগের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যখন লিপিকৃত হল তখন তার আদি বৈশিষ্ট্য আর বিদ্যমান ছিলোনা, তা সংস্কৃতের নিকটবর্তী হয়ে পড়েছিলো। এ কারণেই ঋগ্বেদের ভাষাকে বৈদিক সংস্কৃত বলা হয়। ঋগ্বেদের উষা, নদীস্তুতি ইত্যাদি সূক্তকাব্যের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মনোহর। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম স্তুতিগুলি আর্যদের সপ্তসিন্ধু প্রবেশের তিনশত বছর পরে রচিত হয়। তারও পরে দুশত বছর পর্যন্ত আরও অনেক স্তুতি রচিত হতে থাকে। তারও পরে তিন শতাব্দীর মধ্যে 'শতপথ',

'ঐতরেয়', 'তৈত্তিরীয়', 'আদি ব্রাহ্মণ' রচিত হয়। এ-সমস্ত রচনা দার্শনিক দৃষ্টিতে বিশেষ মহত্তপূর্ণ। এ-সমস্ত রচনার মধ্যে উপনিষদের যে প্রকাশ ঘটেছিলো তার তাৎপর্য অদ্যাবধি স্বীকৃত। উপনিষদের কাল শেষ হলে আমরা নতুন দেশজ ভাষার বিকাশ দেখি। গৌতম বুদ্ধের মুখনিঃসৃত পংক্তিকে পালি বলা হয় এবং সে-সময় দেশের সর্বত্র বুদ্ধবচন প্রসার লাভ করেছিলো বলে এ-সময়কালকে (৬০০—১ খৃঃ পূ:) পালিকাল বলে রাহুল সাংকৃত্যায়ন চিহ্নিত করেছেন। এ-সময়ে স্থবিরবাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'ত্রিপিটক' এবং অশোকের 'শিলালেখ' রচিত হয়েছিলো। এ-সময়কালের সংস্কৃত ভাষার নমুনা হিসেবে আমরা 'মহাভারত' এবং 'রামায়ণ'-এর উল্লেখ করতে পারি। মহাভারতের রূপে এ-সময় সংস্কৃতের একটি বিশাল সংগ্রহ আমরা পাই। ব্যাস অথবা পরাশর-পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে মহাভারতের আদি স্রষ্টা বলা হয়ে থাকে। বশিষ্ঠের পৌত্র পরাশরের সন্তান বিধায় ব্যাসের সময়কাল তো খৃষ্টপূর্ব একাদশ শতক হয় যখন ঋগ্বেদের ভাষা প্রচলিত ছিলো। কিন্তু মহাভারতের ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার মিল নেই। যেরূপে মহাভারতের ভাষাকে আমরা পাচ্ছি তার প্রাচীনতম অংশ খৃষ্টপূর্ব দু'শতকের পিছনে যেতে পারেনা। প্রায় একই সময়ে রামায়ণ রচিত হয়েছিলো। রামায়ণ একটি পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্য এবং সে অর্থে রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকি আদিকবি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকেন।

প্রায় ছয় শতাব্দী ধরে পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে খৃষ্টাব্দের সূত্রপাতে ভারতবর্ষের ভাষা একটি নতুন রূপ লাভ করে যাকে আমরা 'প্রাকৃত' বলে আখ্যায়িত করে থাকি। প্রাকৃত শব্দ দ্বারা একক বা বিশিষ্ট কোনও ভাষা বুঝায় না কিন্তু একটি ভাষাগোষ্ঠীর স্বভাব বুঝায়। প্রাকৃত ছিলো লোক-ভাষা। জৈন পণ্ডিতগণ তাঁদের কিছু আগম প্রাকৃত ভাষায় লিখেছিলেন। কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ নিকায় তাদের পিটক প্রাকৃত ভাষায় পাঠ করতেন। এই প্রাকৃতকাল ছিলো সংস্কৃত কাব্যের স্বর্ণযুগ। খৃষ্টীয় ১ম থেকে ৫৫০ শতাব্দীতে অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস এবং ভারবিকে পাই। অশ্বঘোষ 'বুদ্ধচরিত' কাব্যের জন্য বিখ্যাত। তাঁর অন্য একটি কাব্যের নাম 'সৌদরনন্দ'। তা ছাড়া তাঁর দুটি নাটকও আছে—"রাষ্ট্রপাল" এবং 'সারিপুত্রপ্রকরণ'। ভাস প্রাচীন

সংস্কৃতের খ্যাতনামা নাটককার ছিলেন। মহাভারত এবং রামায়ণের কথা নিয়ে তাঁর অধিকাংশ নাটক রচিত। তাঁর বিখ্যাত নাটকের নাম 'স্বপ্নবাসবদত্তা'। কালিদাসের আবির্ভাব হয়েছিলো খৃষ্ট চতুর্থ শতকে। সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাটককার হিসেবে কালিদাস বিশ্ববিখ্যাত। তিনি ছিলেন গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভাকবি। কালিদাসের কৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'ঋতুসংহার', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', 'রঘুবংশ', 'শকুন্তলা'। কবি ভারবির একটিমাত্র কৃতির উল্লেখ পাই যার নাম 'কিরাতার্জুনীয়'।

৫৫০ খৃষ্টাব্দ থোক ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে ভারতীয় সাহিত্যের অপভ্রংশ কাল বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। বাণ ভাষাকবি ঈশাণের নামোল্লেখ করেছেন প্রাকৃত কবিকূল থেকে ভিন্ন বলে। এতে ধারণা হয় যে বাণের সময়কালে লোক-ভাষা প্রাকৃত থেকে ভিন্ন ছিলো। খৃষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দে পতঞ্জলী অপভ্রংশ শব্দের উল্লেখ করেছেন। তিনি সংস্কৃত থেকে ভ্রষ্ট উচ্চারণের ভাষাকে অপভ্রংশ বলেছেন। বাণের পর থেকেই প্রাকৃতের মত বিশেষ বিশেষ ভাষার সামগ্রিক পরিচয়সূত্রে অপভ্রংশের উল্লেখ আমরা পাই। ঈশাণ এই অপভ্রংশ ভাষারই কবি ছিলেন। বাংলাদেশের কবি সরহপাও অপভ্রংশ ভাষারই কবি। অপভ্রংশ যুগের পূর্বকালে সংস্কৃতের প্রতিপত্তি আমরা লক্ষ্য করি সুবন্ধু, দণ্ডী এবং বাণের গদ্যরচনায়। সুবন্ধুর আবির্ভাবকাল প্রাকৃত ও অপভ্রংশের সন্ধিক্ষণে। দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের একটি বিশিষ্টার্থক গ্রন্থ। দণ্ডীর অন্য একটি অলঙ্কার গ্রন্থের নাম 'ছন্দোবিচিতি'। অবশ্য দণ্ডী অদ্যাবধি সাহিত্য জগতে পরিচিত রয়েছেন তাঁর 'দশকুমারচরিতে'র জন্য। এ-সময়কালে বিজ্জা নামক এক মহিলাকবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বাণ-রচিত 'হর্ষচরিত' এবং 'কাদম্বরী' চিরায়ত সংস্কৃত সাহিত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'কাদম্বরী' একটি ঐশ্বর্যের এবং প্রতিপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করে। উজ্জেন নগরের বর্ণনার সূত্রপাতে কবি লিখছেন, "অবন্তি দেশে ত্রিভুবনে ললাম সত্যযুগের জন্মভূমির মত উজ্জেন নামক এক নগরী আছে যাকে ত্রিভুবনের সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকারী ভূতপতি ভগবান মহাকাল নামক ভূতনাথ নিজ নিবাসের জন্য দ্বিতীয় পৃথিবীর মতো উৎপন্ন করেছিলেন।' এ-সময়কার আরও দুজন কবি হচ্ছেন 'শিশুপালবধ' কাব্যের মাস এবং 'মালতী মাধবে'র রচয়িতা ভবভূতি।

ভবভূতির নাটকগুলো ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে বিশ্ব-খ্যাত হয়েছে। তাঁর অন্য দুটি নাটকের নাম 'উত্তররামচরিত' এবং 'মহাবীরচরিত'। অপভ্রংশ যুগের সর্বশেষ পর্যায়ে সংস্কৃতের অবক্ষয়ের কালে রিরংসা এবং রতিকাব্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এ-পর্বের উল্লেখযোগ্য দুজন কবি হচ্ছেন বিল্‌হন্‌ এবং জয়দেব।[১]

দুই

বিল্‌হন্‌ ছিলেন জীবনরসিক, বিলাসী এবং উজ্জ্বল পুরুষ। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন। তৎকালীন নগরজীবনের ঐশ্বর্য এবং সংস্কৃতির স্বাদ গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় রাজন্যবর্গের স্তব করেছেন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং চতুরতাকে ভূষণ করেছেন। অর্থাৎ জীবনকে সর্বতোভাবে উপভোগ করবার প্রচেষ্টা তাঁর ছিলো।

বিল্‌হনের জন্মভূমি কাশ্মীর। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর পরিচয়সূত্রে লিখছেন যে তাঁর পিতার নাম ছিলো জ্যেষ্ঠকলশ, দাদার নাম রাজকলশ এবং পরদাদার নাম মুক্তিকলস। মাতার নাম ছিলো নাগদেবী। তাঁর দুই ভাই ছিলো—একজনের নাম ইষ্টরায় এবং অন্য জনের নাম আনন্দ। 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' কাব্যে তিনি আপন পরিচয় বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।[২]

কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিনী'তে কবি বিল্‌হনের উল্লেখ আছে।[৩] 'রাজ-তরঙ্গিনী'র সপ্তম তরঙ্গের ৯৩৭ শ্লোকে কল্‌হন বলছেন যে কবি বিল্‌হন্‌ কাশ্মীর ত্যাগ করে কর্ণাটের রাজা পরমাস্তির বিদ্যাপতি হয়েছেন এবং রাজ-আনুগত্য পেয়েছেন। সে-সময় কাশ্মীরের রাজা ছিলেন কলশ নামক একজন বদান্য নৃপতি। কলশের রাজ্যকাল ছিলো ১০৬৩-১০৮৯ খৃষ্টাব্দ।[৪] বিদ্যা সমাপনের পর বিল্‌হন্‌ অনুকূল রাজদরবারের অনু-সন্ধানে মথুরা, কন্নৌজ, প্রয়াগ ইত্যাদি স্থানে গমন করেন। অবশেষে কল্যাণ নগরে উপনীত হয়ে সেখানকার চালুক্যবংশজ রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের (১০৭৬—১১২৭ খৃঃ) আশ্রিত হন। বিক্রমাদিত্যকে উপলক্ষ্য করে বিল্‌হন্‌, ১৮ সর্গের 'বিক্রমদেবচরিত' রচনা করেন। বিল্‌হনের দ্বিতীয় কাব্য হচ্ছে 'বিল্‌হন্‌-চরিত' সেখানে গুজরাটের রাজা বীরসিংহের কন্যা শশিকলার সঙ্গে কবির প্রণয়ের বিবরণ আছে। 'চৌরপঞ্চাশিকা' 'বিল্‌হন্‌-চরিতের' একটি অংশ

চৌরপঞ্চাশিকার গল্পাংশ নিম্নরূপ :

স্বর্গভূমির নির্মল মণ্ডলখণ্ডের সমান মহিলপত্তন নামক ভূমিতে সুন্দর দেহধারী গুর্জরজনের দ্বারা সেবিত বীরসিংহ নামক ভোগী নৃপতি ছিলেন।

এহেন নৃপতি অবন্তি রাজের পুত্রীকে বিধিপূর্বক বিবাহ করে সুপত্নী বানিয়ে সকল সুন্দরীর মধ্যে প্রধানা করলেন। বিমল লক্ষ্মীসদৃশা চন্দ্রমুখী শশিকলাকে জন্ম দিলেন।

শশিকলা শশীর কলার মতো বাড়তে লাগলো। রাজার বিশিষ্ট কন্যা ভাগ্যশালিনী অল্প দিনের মধ্যেই বচনামৃতের দ্বারা পিতাকে সন্তুষ্ট করতে লাগলো। কমলপত্রসদৃশ নেত্রযুক্ত নররাজের কন্যা লীলাভরে মধুর বচন উচ্চারণ করতো এবং সে-বচন বীরসিংহের চিত্তে অমৃতসমান সুখ-দায়ক মনে হত।

এমতাবস্থায় একদিন রাজার পুরোহিত কবি বিল্‌হন্‌কে নিয়ে রাজ-দরবারে উপস্থিত হলেন এবং রাজাকে নিবেদন করলেন, "হে ক্ষিতিপতি, এই কাশ্মিরী বিল্‌হন্‌ নামক কবি গুণীকে দেখবার ইচ্ছায় আপনার দরবারে এসেছে। মন্ত্র-অর্থতন্ত্রের উৎপাদিকা এবং শ্রুতির জননী শ্রীশারদার দেশ থেকে এ এসেছে।" বীর নৃপতি কবির নমস্কার গ্রহণ করলেন এবং কবিকে কন্যার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করলেন। শশিকলা কবির নিকট প্রাকৃত এবং নির্মল সংস্কৃতশাস্ত্র পাঠ করলো।

প্রাকৃত এবং সংস্কৃত শিক্ষালাভের পর কেসর-পুষ্পের এবং কর্পূর ও অগর-চন্দনের গন্ধযুক্ত ঘরে শশিকলা কবির নিকট শৃঙ্গার এবং কাম-শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করলো। কামকলা জ্ঞাত হবার পর কামবাণে সে বিদ্ধ হল। প্রেমাভিভূত নেত্র দ্বারা, সুন্দর হাস্য ও অমৃত-অধরের দ্বারা এবং উদ্বুদ্ধ দু-স্তনের দ্বারা শশিকলা সংযমী এবং বিদ্বান কবিকে বশীভূত করলো। লক্ষ্মীর কমলপত্রের মতো নেত্রযুক্ত পদ্মিনী শশিকলাকে কবি আপন আরাধ্যা করলো। শশিকলা কবির নিকট আপন অনুরাগকে ব্যক্ত করলো, "হে স্বামী সকলের চিত্তের জন্য দুটি প্রজ্ঞা প্রয়োজন, একটি হচ্ছে শিবের তত্ত্বজ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে শিব-দায়ক কামতত্ত্ব। এ মুহূর্তে তুমি আমার যোগ্য কামগুরু।" একান্তে এবংবিধ উচ্চারণের পর কবি

সব দিক বিবেচনা করে গন্ধর্ববিবাহবিধিতে শশিকলার পাণিগ্রহণ করলো। এরা উভয়েই লীলা-বিলাসে সময় কাটাতে লাগলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাজার প্রহরীর নিকট এদের গোপন অভিসার ধরা পড়লো। প্রহরী রাজ সম্মুখে এসে যুগ্ম হস্তে নিবেদন করলো, "হে দেব, অভয় দিলে আমি বলি যে শশিকলাকে তার গুরু উপভোগ করেছে, আমি নিশ্চিত উক্ত গুরুকে শশিকলার কক্ষে গোপনে প্রবেশ করতে দেখেছি।"

রাজা সর্বপ্রকার অনুসন্ধান করে যখন বিল্‌হনের অপরাধ সত্য বলে প্রমাণ পেলেন তখন তাকে শূলীদণ্ড দিলেন। কবিকে ভয়ংকর বধ্যস্থানে নিয়ে প্রহরীগণ বললো, "হে সুকবি স্নান করো এবং প্রণমে দেবতাকে ধ্যান কর। অন্তে যা হবার তাতো হবেই।"

এরপর কবি বিল্‌হন্ পঞ্চাশটি শ্লোকে প্রিয়া শশিকলাকে স্মরণ করলো, এই পঞ্চাশটি শ্লোকই 'চৌরপঞ্চাশিকা'। পঞ্চাশটি শ্লোক আবৃত্তি করার পর কবি বিল্‌হন্ করাল কালীদেবীকে আহ্বান করলো। কালী আবির্ভূতা হয়ে মধ্যস্থতা করে শূলীদণ্ড থেকে কবিকে মুক্ত করলো। তারপর শশিকলার সঙ্গে কবির মিলনকে বিবাহবন্ধনে সমর্থিত করা হল।

তিন

'চৌরপঞ্চাশিকা' একটি অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ। কবি প্রেমস্মৃতিকে বর্ণনীয় বিষয় করে চৌরপঞ্চাশিকার পঞ্চাশটি শ্লোক নির্মাণ করেছেন। এ-কাব্যের মূল আবেগ হচ্ছে শৃঙ্গাররস। একই স্তবকের মধ্যে বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগের উল্লেখ আছে। প্রতিটি শ্লোকের পূর্বে 'অদ্যাপি' শব্দটি আমরা পাই। এই শব্দের দ্বারা পুরাতন স্মৃতির উদ্‌ঘাটন করা হচ্ছে। সুতরাং একই সঙ্গে বিরহ এবং সম্ভোগ উপস্থাপিত হচ্ছে। 'অদ্যাপি' শব্দের দ্বারা কবি একটি পুরাতন সময়কালের বিবরণ যেমন উপস্থিত করছেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে তার চিত্তের অবস্থাও ব্যাখ্যা করছেন।[৫] স্মৃতিলব্ধ এই বর্ণনাগুলোর বৈশিষ্ট্য এখানে যে বর্ণনাগুলো পাঠকের জন্য একটি দৃশ্যগোচরতা নির্মাণ করে।

আমি মূলের ভাবপ্রকল্পকে গ্রহণ করে ছন্দবদ্ধ অভিপ্রায়ে অনুবাদ করেছি। অনুবাদটি শব্দগত নয়, ভাবগত। যেহেতু মূল কাব্যে পুনরাবৃত্তি

রয়েছে সুতরাং অনুবাদের ক্ষেত্রে সেই পুনরাবৃত্তিকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ-প্রকল্পের সাহায্যে উপস্থিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি স্তবকের বা শ্লোকের আরম্ভের 'অদ্যাপি' শব্দটি আমি বিদ্যমান রেখেছি।

বাঙালী পাঠকের কাছে বিল্‌হনের 'চৌরপঞ্চাশিকা' সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমরা শুধু সংবাদ হিসেবে জানি যে ভারতচন্দ্র চৌরপঞ্চাশিকার আদলে তার 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেছিলেন। ভারতচন্দ্র যারা পাঠ করে থাকেন তাঁদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বিদ্যাসুন্দরের মূল উৎসের অনুবাদ উপস্থিত করা হল।

ভারতচন্দ্র 'চৌরপঞ্চাশিকা' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং কিছু শ্লোকের অনুবাদও করেছিলেন।[৬] 'অন্নদামঙ্গলে'র বিদ্যাসুন্দর অধ্যায়ের শেষে এর স্বীকারুক্তি আছে :

"চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া।
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া॥
শুনি চমকিত লোক শুনি চমকিত লোক।
কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক॥

ভারতচন্দ্র যে শ্লোকগুলো অনুবাদ করেছিলেন মূলসহ সে অনুবাদ-গুলো নিম্নে উপস্থিত করছি :

মূল

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদাম গৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম।
সুপ্তোত্থিতোং মদনবিহ্বললাল সাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি॥

ভারতচন্দ্রের অনুবাদ

এখনো সে কনকচম্পকসুবরণী।
তনুলোমাবলী ফুল্লকমলবদনী॥
শুইলা উঠিল কামবিহ্বললালসা।
প্রমাদ গণিছে মোর শুনি এই দশা॥

মূল

অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমৃণালপন্ত্যা ॥

ভারতচন্দ্রের অনুবাদ

এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্ব্বথা।
এক রাতি মোর দোষে না কহিল কথা ॥
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে।
ছলে হাঁচিলাম জীববাক্য বলাইতে ॥
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল।
জানায়ে পরিল কানে কনককুণ্ডল ॥

মূল

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূট
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি—
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥

ভারতচন্দ্রের অনুবাদ

এখনো কণ্ঠের বিষ না ছাড়েন হর।
কমঠ বহেন পিঠে ধরণীর ভর ॥
বারিনিধি দুর্ব্বহ বাড়ব-অগ্নি বহে।
সুকৃতির অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে ॥

ভারতচন্দ্রের অনুবাদ অসাধারণ। মূলের সঙ্গে শব্দার্থগত সাজুয্য রক্ষা করে তিনি বাংলাভাষার গ্রহণযোগ্য একটি শোভন কাব্য নির্মাণ করেছেন। যদি সম্পূর্ণ অনুবাদ তিনি করে যেতেন তা হলে অন্য কারও অনুবাদ করার প্রয়োজন হতোনা। কেননা, ভারতচন্দ্রকে অতিক্রম করা কারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়।

চার

'চৌরপঞ্চাশিকা' প্রথমে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয় স্যার এডউইন আরনল্ড-এর অনুবাদের মাধ্যমে। আরনল্ড অনুবাদে স্বাধীনতা নিয়েছিলেন। মূলের ভাবপ্রকল্প অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি নিজস্ব ভঙ্গীতে একটি কাব্যপ্রক্রিয়া নির্মাণ করেছিলেন। আরনল্ড তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন যে, ১৭৯৮ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মহাফেজখানায় 'চৌরপঞ্চাশিকা'র সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিস্কৃত হয়। উক্ত পাণ্ডুলিপি ল্যাটিন অনুবাদসহ বার্লিনে মুদ্রিত হয়। এই কপিটি সংগ্রহ করে আরনল্ড 'চৌরপঞ্চাশিকা'র ইংরেজী অনুবাদ করেন। তিনি কাহিনী-সংক্ষেপে লিখেছেন যে, কাঁচিপুরের রাজা সুন্দভের দরবারে 'চৌর' নামক একজন যুবক ব্রাহ্মণ ছিলো। সে মহারাজার সুন্দরী কন্যা 'বিদ্যা'র প্রণয়াসক্ত হয়। বিদ্যাও তাঁর প্রতি আসক্তি জ্ঞাপন করে। এদের গোপনমিলন যখন মহারাজা জানতে পারেন, তখন তিনি 'চৌর' কে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা দেন। বন্দী দশায় 'চৌর' কিছু পদ রচনা করে। সেগুলি শ্রবণ করে মহারাজা মুগ্ধ হন এবং তাকে মুক্ত করেন। অরানল্ড বর্ণিত 'চৌর' শব্দটির মধ্যে ভ্রান্তি আছে। এই ভ্রান্তি ঘটেছে 'চৌর-পঞ্চাশিকা' নাম থেকে। নায়কের নাম ছিল 'বিল্‌হন্'। নায়িকার নাম 'চম্পাবতী'। তার অন্য নাম 'শশিকলা'। যেহেতু বিদ্যা অর্জনের জন্য সে বিল্‌হনের কাছে পাঠ গ্রহণ করেছিলো সে-জন্য তাকে 'বিদ্যা'ও বলা হতো।

এ-কাব্যটি কয়েকটি নামে পরিচিত ছিলো। যেমন 'চৌরীসুরত-পঞ্চাশিকা,' "বিল্‌হন্‌পঞ্চাশিকা" এবং "শশিকলাপঞ্চাশিকা'। মূলতঃ কাব্যটি 'বিল্‌হন্‌চরিতের' অংশবিশেষ। বিলহনের রচিত অন্যান্য রচনার নাম 'কর্ণসুন্দরী নাটক,' "বিক্রমাঙ্কচরিত"। 'পূর্বপিঠিকা' বলে 'বিল্‌হন্‌চরিত' কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ পেয়েছে। তবে বর্তমানে আমরা জানি যে 'চৌরপঞ্চাশিকা' 'বিল্‌হন্‌চরিতে'র একটি অধ্যায় মাত্র, অবশ্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কথিত আছে যে, রাজা যখন বিল্‌হন্‌কে তাঁর কন্যার শিক্ষক নিযুক্ত করলেন তখন কন্যাকে বললেন যে বিল্‌হন্ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। সে কারণে পর্দার আড়ালে থেকে তোমাকে শিক্ষা দিবে। অন্য পক্ষে বিল্‌হন্‌কে বললেন যে, তাঁর কন্যা অন্ধ। সুতরাং তাকে পর্দার আড়ালে রাখা হবে। তবে রাজার এই

চাতুরী কন্যা এবং শিক্ষকের কাছে অতি সহজেই ধরা পড়ে যায়। তাঁরা একে অন্যকে দেখে ফেলে এবং প্রণয়লীলায় লিপ্ত হয়।

'চৌরপঞ্চাশিকা' 'শশিকলা বিরহপ্রতাপ' নামে ষোড়শ শতকে গুজরাটী ভাষায় অনূদিত হয়। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে এটি মারাঠী ভাষায় অনূদিত হয়। 'চৌরপঞ্চাশিকা'র আঠারটি রঙীন চিত্র পাওয়া গিয়েছে। প্রতিটি চিত্রের আকার ৭¾×৯¾ ইঞ্চি। চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি ষোড়শ শতকের গুজরাটী মিনিয়েচারের অনুরূপ। সম্প্রতি নতুন দিল্লীর জাতীয় যাদুঘর 'চৌরপঞ্চাশিকা'র এই চিত্রগুলি মুদ্রিত করেছে।[৭]

পাঁচ

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যটি তাঁর 'অন্নদামঙ্গল'কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড রূপে পরিচিত। 'বিদ্যাসুন্দর'-এর কাহিনীটি বিল্হন্-এর কাহিনীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও ভারতচন্দ্র কাহিনীটিকে নবরূপে সজ্জিত করেছেন। ভারতচন্দ্রের কাহিনীটি নিম্নরূপ :

বর্ধমানে বীরসিংহ নামে এক নৃপতি ছিলেন। রূপে গুণে সরস্বতী ছিলো বিদ্যা নামে তাঁর এক কন্যা। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, তার কাছে বিচারে যে জয়লাভ করবে তাকেই সে পতিত্বে বরণ করবে। বহু রাজপুত্র এলো কিন্তু কেউ জয়লাভ করতে পারলো না। শেষে রাজা কাঞ্চীর রাজার কাছে খবর পাঠালেন যেনো তাঁর গুণবান পুত্র 'সুন্দর' বিচারে অংশ গ্রহণ করে এবং জয়লাভ করে বিদ্যাকে বিবাহ করে। বাটের মুখে বিদ্যার রূপ-গুণ শুনে 'সুন্দর' ছদ্মবেশ ধারণ করে বর্ধমান যাত্রা করলেন। নগরের নারীরা 'সুন্দর'কে দেখে আকুল হলো। বর্ধমান শহরে রাজগৃহে এক মালিনীর সঙ্গে 'সুন্দর'-এর সাক্ষাত হলো, যে রাজগৃহে নিয়মিত ফুল দিয়ে থাকে। সুন্দর মালিনীকে মাসী বলে তার আতিথ্য গ্রহণ করলো। মালিনীর মাধ্যমে 'সুন্দর' কৌশলে 'বিদ্যা'র সঙ্গে পরিচিত হয় এবং গোপনে সুরঙ্গ খনন করে বিদ্যার কক্ষে প্রবেশ করে। সেখানে বিচারে বিদ্যাকে পরাজিত করে গান্ধর্ব্যবিবাহে বিদ্যাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করে। এভাবে গোপন যাতায়াত হঠাৎ একদিন কোটালদের কাছে ধরা পড়ে যায় এবং 'সুন্দর' বন্দী হয়ে রাজদরবারে নীত হয়। রাজা যখন সুন্দরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তখন 'সুন্দর' 'চৌরপঞ্চাশিকা'র

শ্লোকগুলি পাঠ করেন। রাজা 'সুন্দর'কে প্রাণদণ্ড দিতে অপারগ হন। কেননা দেবী কালী এসে সুন্দরের পক্ষ অবলম্বন করেন। অবশেষে রাজা সুন্দরের যথার্থ পরিচয় জেনে আনন্দিত হন এবং কন্যা-জামাতাকে সাদরে গ্রহণ করেন।

ভারতচন্দ্রের কাব্যটি স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। অনবদ্য বাক্‌চাতুর্য্য, শব্দগত কৌশল এবং সাবলীল শব্দের প্রশ্রয়ে এ-কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের একটি অসাধারণ কাব্য-প্রক্রিয়া হিসেবে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শব্দ-শৈলীর যে বিস্ময়কর বিন্যাস এ-কাব্যে আমরা লক্ষ্য করি তা অনন্য-সাধারণ। শব্দকে ধ্বনির অনুগত করে এবং ধ্বনিকে শব্দের মধ্য থেকে উৎসারিত করে যে ব্যঞ্জনা ভারতচন্দ্র দান করেছেন তা অদ্যাবধি অতুলনীয় হয়ে রয়েছে। যেখানে বিল্‌হন্‌-এর কাব্য গম্ভীর এবং শান্ত সেখানে ভারতচন্দ্রের কাব্য যৌবনের চাঞ্চল্যের মতো মনোহারিত্যে উজ্জ্বল। সাধারণ চলিত বুলিকে ধ্বনির বিভঙ্গে যে বিস্ময়কর রূপে ভারতচন্দ্র উপস্থাপিত করেছেন, তা বাংলা কাব্যের জন্য নতুন পথপ্রদর্শক হয়েছে। আমি নিম্নে একটি উদাহরণ উপস্থিত করছি :

বেসাতি কড়ির লেখা বুঝরে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥
পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা।
যদি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়।
এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায়॥
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু দু কাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধসের খাইতে সন্দেশ॥
আট পণে আধসের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
দুর্ল্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥
কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরা।
যেটি কয় সেটি লয় নাহি লয় ফিরা॥

দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান।
আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান॥
অবাক হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক।
নাহি বিনা দোকানির না সরে গুবাক॥
দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদী পারে।
আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে॥
আট পণে আনিয়াছি কাঠ আট আটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেঁচে তারে নাটি আটি॥
খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে॥
লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ি।
শেষে পাছে বল মাসী খোয়াইল খড়ি॥
মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥
শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥

উপরের উদ্ধৃতিতে সাধারণ গ্রামীণ শব্দগুলোকে ভারতচন্দ্র ছন্দ-চাতুর্যের লীলায়, অনুপ্রাসের বন্ধনে এবং অর্থ-দ্বৈতের কৌশলে একটি অপূর্ব গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে এনেছেন। ভারতচন্দ্রের পূর্বে কোনও মধ্যযুগের কবি এহেন পরীক্ষায় অগ্রসর হননি। ভারতচন্দ্রের পরেও কেউ এ-পথে পদচারণ করেননি। এহেন নিরীক্ষায় ভারতচন্দ্র একমাত্র সম্রাট।

সংস্কৃত শাস্ত্রসম্মত কাব্যের বিবিধ অলংকার ভারতচন্দ্র ব্যবহার করেছেন। এই সব অলংকার ব্যবহার করতে গিয়ে তিনি শোভন এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ করেন নি। বরঞ্চ দেশজ এবং গ্রাম্য ভাষাকে ব্যবহার করে তার মধ্যেই অলংকারের অনুকূল্য সাধন করেছেন। ভারতচন্দ্রের অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি শব্দ ও অর্থের শোভা বর্ধন করে যথার্থ রস সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। তিনি যে শব্দই ব্যবহার করুন না কেন, অলংকার ব্যবহারের মধ্যে বুদ্ধি এবং আবেগ উভয়েরই পরিচয় এনেছেন। শুধুমাত্র বুদ্ধির পরিচয় থাকলে আড়ষ্টতা আসতো। কিন্তু বুদ্ধির সঙ্গে আবেগ সংযুক্ত হয়ে কাব্যের উৎকর্ষ সাধন করেছে।

ভারতচন্দ্রের শব্দ ব্যবহারে অর্থের পুনরুক্তি আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু এই পুনরুক্তি ধ্বনিসুষমার জন্য একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। যেমন সংস্কৃতে 'হরঃ শিবঃ' অথবা 'শশি-শুভ্রাংশু' একই অর্থের দুটো করে শব্দের মিলন অথচ কাব্যের প্রয়োজনে অবাস্তব নয়, ভারতচন্দ্র তেমনি একই অর্থের দু'টি শব্দের সংযোজন বহুস্থলে ঘটিয়েছেন। অনুপ্রাসের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র বাংলা কাব্যের একচ্ছত্র সম্রাট। কোথাও স্বরবর্ণের সাদৃশ্যে, কোথাও শব্দসাদৃশ্যে এবং কোথাও ব্যঞ্জনবর্ণের সাদৃশ্যে তিনি অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে যাকে বলে, যে বিন্যাস রসাদির অনুগত সে বিন্যাসের প্রকৃষ্ট বিকাশ হচ্ছে অনুপ্রাস, ভারতচন্দ্রের কাব্যে সে অনুপ্রাসকেই আমরা পাই। যে ধরনের অনুপ্রাসই হোকনা কেন তাকে রসের পরিপোষণকারী হতে হবে। ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে যেসব অলংকার ব্যবহার করেছেন তা সবই রসের পরিপোষণকারী। আবার অনেক সময় লক্ষ্য করি যে, শব্দের পুনরুক্তি তিনি ঘটিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে তাৎপর্যের বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। তবে 'অন্নদামঙ্গলের' দ্বিতীয় খণ্ডে অর্থাৎ 'বিদ্যাসুন্দর' অধ্যায়ে ভারতচন্দ্র যে অসাধারণ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তা হচ্ছে লোকজ শব্দের মধ্যে সংস্কৃত অলংকারের প্রয়োগ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এটা অসম্ভব কিন্তু সেই অসম্ভবকেই তিনি সম্ভব করে তুলেছেন। তৎসম শব্দ যেখানে বাংলা ভাষার শোভা এবং স্বাভাবিক ঐশ্বর্য সেখানে দেশী শব্দকে ব্যবহার করে ভারতচন্দ্র নতুন ঐশ্বর্যের সৃষ্টি করেছেন। এবং এই শব্দগুলো অপ্রতিহতভাবে এবং আপন গৌরবে নতুন নতুন ধ্বনিব্যঞ্জনা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এক প্রকার দ্বিধাহীন নিশ্চিন্ততায় স্বচ্ছন্দ আবর্তে এসব শব্দ সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। যে-সব মানুষের কথা তিনি বলেছেন সে-সব মানুষকে তাদের ইচ্ছার ভূ-মণ্ডলে প্রকাশ করতে গিয়েই তাঁকে এসব শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে।

ভারতচন্দ্রের শব্দব্যবহারের চতুরতা বিদ্যুৎস্ফুলিংগের মতো নিম্নের উদ্ধৃতিতে ধরা পড়েছে :

শুন রাজা মহাশয় শুন রাজা মহাশয়।
চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়॥

আমি রাজার কুমার আমি রাজার কুমার।
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার॥
বিদ্যাপতি মোর নাম বিদ্যাপতি মোর নাম।
বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম॥
শুন শ্বশুর ঠাকুর শুন শ্বশুর ঠাকুর
আমার বাপের নাম বিদ্যা শ্বশুর॥
তুমি ধর্ম্মঅবতার তুমি ধর্ম্মঅবতার।
অবিচারে চোর বল এ কোন্ বিচার॥
বিদ্যা করেছিল পণ বিদ্যা করেছিল পণ।
সেই পতি বিচারে জিনিবে যেই জন॥
পণে জাতি কেবা চায় পণে জাতি কেবা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়।
দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ।
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ॥
তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে।
বিচারে হারিয়া পতি করিল আমারে॥
আমি যে হই সে হই আমি যে হই সে হই।
জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই।
মোর বিদ্যা মোরে দেহ মোর বিদ্যা মোরে দেহ।
জাতি লয়ে থাক তুমি আমি যাই গেহ॥
বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ।
তপ জপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান॥[৮]

ছয়

ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত সর্বপ্রথম রচনা করেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত। এবং অদ্যাবধি এই জীবনবৃত্তান্তের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। ভারতচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন কাব্যে আপন জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আত্মপরিচয় দিয়েছেন। সে সব পরিচয় থেকে আমরা তাঁর বংশের ইতিকথা কিছুটা পাই। 'সত্যপীরের কথা'য় ভারতচন্দ্র যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

ভরদ্বাজ অবতংশ ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হতকংস ভুরসুটে বসতি।

নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতীযুত,
কুলের মুখটি খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি।

এ উদ্ধৃতিতে আমরা সংবাদ পাচ্ছি ভরদ্বাজ বংশে যে ভূপতি রায় জন্মগ্রহণ করেন ভারতচন্দ্র সে বংশেরই সন্তান। তাঁর জন্মস্থান ছিল 'ভুরসুট' গ্রাম। হুগলী জেলার দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে ভুরসুট গ্রামের অবস্থান ছিল। কোলকাতা শহর বঙ্গ অঞ্চলের সংস্কৃতির কেন্দ্র হয় উনবিংশ শতাব্দীর সূত্রপাত থেকে। তার পূর্বে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভুরসুট গ্রামটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিলো। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই গ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমৃদ্ধশালী শ্রেষ্ঠীরা এই গ্রামে বসবাস করতেন বলে এই গ্রামের একটি প্রাচীন নাম হচ্ছে 'ভুরিশ্রেষ্ঠী'।

হাওড়া হুগলীর সীমান্তে এই ভুরসুটের উপকন্ঠে বসন্তপুরে ভারত-চন্দ্রের নিবাস ছিলো। এই ভুরসুট-মুন্দারণে ইসমাইল গাজীকে উপলক্ষ্য করে একটি পীরের খান্‌কা বা আস্তানা গড়ে উঠেছিলো। সতের-আঠার শতকের 'ধর্মমঙ্গল-মনসামঙ্গল' কাব্যে এই পীরের বন্দনা আছে। পীর ইসমাইল গাজী পরবর্তীকালে 'বড় খাঁ' গাজী রূপে বন্দনা পেয়েছেন। আঠার শতকে এই 'বড় খাঁ' গাজীকে আশ্রয় করেই ভুরসুট-মুন্দারণে দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিলো। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে। তার পরপরই ভুরসুট-মুন্দারণ অঞ্চলে দো-ভাষী পুঁথির আবির্ভাব ঘটে।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের মানসিংহ অধ্যায়ে সমসাময়িক ইতিহাসের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সেই পরিচয় সূত্রে নদ-নদী, জেলা-পরগনা, গ্রাম-নগর ইত্যাদিরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। মানসিংহ অংশে ভারতচন্দ্র আত্মপরিচয় সূত্রে বলছেন:

ফুলের মুখটি নৃসিংহের অংশ তায়।

আবার 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে আত্মপরিচয়সূত্রে কবি বলছেন :

ভুরিশিষ্ট রাজ্যবাসী নানা কাব্য অভিলাষী
যে বংশে প্রতাপনারায়ণ।

এভাবে আমরা জানতে পারি যে, ফুলিয়ার যে মুখটি বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম সেই বংশের আদি পুরুষ ছিলেন নৃসিংহ। নৃসিংহের বংশে ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভূপতি রায় ভারতচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষদের একজন ছিলেন। রাজা প্রতাপনারায়ণ ভারতচন্দ্রের কুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। ভারতচন্দ্রের পিতার নাম নরেন্দ্র রায়। ভারতচন্দ্র হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সীর বাড়িতে ফারসী শিক্ষা করেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভারতচন্দ্রের জন্ম ১১১৯ সন বা ১৭২১ খৃষ্টাব্দ বলেছেন। এ তারিখ নিয়ে সংশয় আছে। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য সংশয় প্রকাশ করে বলছেন :

"গুপ্ত কবির এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত মনে হয় না। কারণ, ১৭২১ খৃষ্টাব্দে যদি কবির জন্ম হয়, তাহা হইলে মৃত্যুকালে (১৭৬০ খ্রীঃ) তাঁহার বয়স হয় মাত্র ৩৯ বৎসর। অথচ, 'নাগাষ্টক' রচনাকলে কবির বয়স চল্লিশ এবং এ গ্রন্থ যে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বের রচনা, এমন কোন প্রমাণ নাই। নাগাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে কবি লিখিয়াছেন :

'বয়শ্চত্বারিংশত্তর সদসি নীতং নৃপ ময়া'-ইত্যাদি, দ্বিতীয়তঃ, দেবানন্দপুরে সত্য পীরের কথা রচনার পূর্ব্বে কবির জীবনে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে মাত্র পনের বৎসরের মধ্যে তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

"বর্দ্ধমান রাজ কীর্তি-চন্দ্রের রাজত্ব কালে (১৭০২–৪০ খ্রীঃ) তাঁহার পিতৃরাজ নাশ হয়। এই সময়ের মধ্যে অনেক দিন (১৪ বৎসর বয়সে) তিনি মাতুলালয়ে বাস করেন, এবং সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য বেশ কিছুকাল ব্যয় করেন। এই সকল শিক্ষার পর কবি সত্যপীরের কথা রচনা করেন। অতএব এই কথা রচনা কালে কবির বয়স পনেরর পরিবর্ত্তে অন্ততঃ ২৫/২৬ হওয়া যেন স্বাভাবিক। কাজেই 'সনে রুদ্র চৌগুণা, কবির এই ইঙ্গিতে 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' নীতি বর্জ্জন করিয়া এ গ্রন্থের রচনা কাল ১১৩৪ এর পরিবর্ত্তে ১১৪৪ (রুদ্র=১১, চৌগুণা—১১×৪=৪৪) ধরাই যুক্তিসম্মত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য গুপ্ত কবি নিজেই পরে আবার নিজেকে সংশোধন করিয়া

রুদ্র শব্দে একাদশ ও শুভঙ্করের গণনামত এগারোকে চারগুণ করিয়া ঐ তারিখ ৩৪ এর পরিবর্ত্তে ৪৪ ধরিয়াছেন। এই ধারণা সত্য হইলে, মোটামুটি অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকের শেষার্দ্ধে কবির জন্মকাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।"[৯]

এভাবে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ভারতচন্দ্রের জীবনকাল ১৭০৫ থেকে ১৭৬০।

ভারতচন্দ্র ফারসী এবং সংস্কৃত উভয় ভাষায়ই যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। জীবিকা-সংগ্রহের জন্য তিনি ফরাসডাঙ্গায় ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর শরণাপন্ন হন। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্য এবং বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হন। তাঁরই চেষ্টায় এবং একান্ত আগ্রহে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি নিযুক্ত হন। কৃষ্ণনগরের রাজার রাজসভায় একজন পারিষদ ছিলেন গোপাল ভাঁড়। রাজার সভাসদ হিসাবে কৃতিত্ব অর্জন করে ভারতচন্দ্র 'গুণাকর' উপাধি লাভ করেন।

ভারতচন্দ্রের প্রধান গ্রন্থ 'অন্নদামঙ্গল'। তিনি 'অন্নদামঙ্গল' রচনা শেষ করেন বাংলা ১১৫৯ সালে। এই অন্নদামঙ্গলের মধ্যেই 'বিদ্যা-সুন্দরে'র উপাখ্যান রয়েছে। ভারতচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থের নাম 'সত্য-পীরের পাঁচালী,' 'রসমঞ্জরী,' 'নাগাষ্টক,' 'বিবিধ কবিতাবলী,' 'গঙ্গাষ্টক,' এবং 'চণ্ডীনাটক'। এ-নাটকটির সূত্রপাত তিনি করেছিলেন কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি।

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' একটি নবনির্মিত কাহিনী। 'চৌর-পঞ্চাশিকা'র সঙ্গে তার পার্থক্য প্রচুর। কিন্তু মিলও আছে অনেক। এই দুই কাব্যের মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক এবং পার্থক্য আছে তা নিম্নে প্রদর্শিত হলো:

১. মূল 'চৌরপঞ্চাশিকা'য় বিল্‌হন্‌ ছিলেন কাশ্মীরের কবি। তিনি মহিলহ হন দেশের সম্মানীয় রাজা বীরসিংহের গুণগ্রামে মুগ্ধ হয়ে কার্যলাভের আশায় তাঁর দরবারে এলেন। রাজার পুরোহিত রাজার নিকট বিল্‌হন্‌কে উপস্থিত করে তাঁকে রাজ-

দরবারে স্থান দেবার জন্য নিবেদন করলেন। রাজা বিল্‌হন্‌ কে রাজদরবারে স্থান দিলেন এবং রাজকন্যা শশিকলার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করলেন।

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে কাঞ্চি রাজার পুত্র 'সুন্দর' বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের কন্যা 'বিদ্যা'র সৌন্দর্যের সংবাদ পেয়ে মুগ্ধ হয় এবং বিদ্যাকে লাভ করবার আশায় ছদ্মবেশে বর্ধমানে যাত্রা করে। বর্ধমানে এসে রাজগৃহে যে-মালিনী নিয়মিত ফুল সংগ্রহ করে দিত সেই মালিনীর গৃহে আশ্রয় লাভ করে। ক্রমশ বিবিধ কৌশলে 'বিদ্যা'র সংগে পরিচিত হয় এবং গোপনে সুড়ঙ্গ করে বিদ্যার সংগে মিলিত হয়।

২. 'চৌরপঞ্চাশিকা'য় রাজকন্যাকে পাঠ দিতে গিয়ে রাজকন্যার সঙ্গে বিল্‌হন্‌-এর প্রেম হয়। রাজকন্যাও বিল্‌হন্‌-এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। পরম অনুরাগবসত রাজকন্যা বিল্‌হন্‌কে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে এবং সুরত-প্রসঙ্গে কাল অতিবাহিত করতে থাকে।

'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে 'বিদ্যা' কে সুন্দর বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে পরাভূত করে এবং তখন উভয়ের মধ্যে গভীর প্রেম সঞ্চার হয়। গান্ধর্বমতে 'সুন্দর' এবং 'বিদ্যা' বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সুরত-প্রসঙ্গে কাল অতিবাহিত করতে থাকে।

৩. 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্যে একজন রাজপ্রহরীর দৃষ্টিতে শশিকলা এবং বিল্‌হনের গোপন মিলন ধরা পড়ে। প্রহরী প্রমাণ প্রদান করে যে শশিকলাকে তাঁর গুরু উপভোগ করেছে। রাজা এই প্রমাণে সুনিশ্চয় হন যে বিল্‌হন্‌ অপরাধী। সুতরাং তিনি বিল্‌হন্‌কে শূলীদণ্ড প্রদান করেন।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে 'বিদ্যা'র গর্ভ সঞ্চার হয় এবং সে-সংবাদ পেয়ে রাজা কোটালদের তিরস্কার করেন। কোটালরা অনুসন্ধান করে 'সুন্দর' কে বন্দী করে। বন্দী 'সুন্দর' রাজদরবারে আনীত হয় এবং রাজা 'সুন্দরে'র পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন।

৪. 'চৌরপঞ্চাশিকা'য় শূলীদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত বিল্‌হন্‌ পঞ্চাশটি শ্লোক পাঠ করে। এই পঞ্চাশটি শ্লোকের মাধ্যমে বিল্‌হন্‌ শশিকলার সঙ্গে তার মিলন এবং অনুরাগের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করে। শ্লোক পাঠের শেষে সে কালী বন্দনা করে। তুষ্ট হয়ে কালী তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। দণ্ডাদেশ থেকে বিল্‌হন্‌ মুক্ত হয় এবং শশিকলাকে প্রাপ্ত হয়।

'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে বন্দী 'সুন্দর' নানাবিধ কৌতুকের মাধ্যমে হেঁয়ালী ভাষায় রাজার প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং 'চৌর পঞ্চাশিকা'র শ্লোক পাঠ করে। শেষ পর্যন্ত রাজা সুন্দরের পরিচয় জেনে সুন্দরকে মুক্ত করেন এবং রাজকন্যাকে সুন্দরের হাতে সমর্পণ করেন।

মূল ঘটনায় উভয় কাব্যের মধ্যে কাহিনীগত একটি মিল থাকলেও প্রকরণগত পার্থক্য রয়েছে। ভারতচন্দ্র 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্যগ্রন্থের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং 'চৌরপঞ্চাশিকা' থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য-সূত্রে তিনি বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীটি পেয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রের পূর্বে কৃষ্ণরাম বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনী অবলম্বন করে সপ্তদশ শতকে 'কালিকামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণরাম কোন সূত্র থেকে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন আমরা জানি না, তবে তিনি যে 'চৌরপঞ্চাশিকা'র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর কালিকামঙ্গলে আছে। তিনি তাঁর কাব্যে 'চৌরপঞ্চাশিকা'র নয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করেছিলেন। এতে মনে হয় 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্য মধ্যযুগে বাংলা ভাষার কবিদের কাছে পরিচিত ছিলো। ভারতচন্দ্র যে কৃষ্ণরামের কাব্য পাঠ করেছিলেন এটা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের মাধ্যমে সহজেই প্রমাণিত হয়। তাছাড়া 'চৌর-পঞ্চাশিকা'র যে-তিনটি শ্লোক তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন সে-শ্লোকগুলির সব কটিই কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গলে' আছে। ভারতচন্দ্রের পর রাম-প্রসাদ 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য লিখেছিলেন। রামপ্রসাদ তাঁর কাব্যে 'চৌর-পঞ্চাশিকা'র পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছিলেন। এই পাঁচটি শ্লোকের সব-কটি কৃষ্ণরামের কাব্যে আছে। সুতরাং ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ উভয়ের উৎস কৃষ্ণরাম এমন কথা বললে খুব অন্যায় বলা হয়

না। তবে 'চৌরপঞ্চাশিকা'ও এরা সরাসরি পাঠ করে থাকবেন, এটাও আশ্চর্য নয়। বিশেষ করে ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রমাণ পাওয়া যায় যে 'চৌরপঞ্চাশিকা'র সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল।

সুতরাং 'বিদ্যাসুন্দরে'র কাহিনী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'চৌরপঞ্চাশিকা'র প্রভাব বিশ্লেষণ করা একান্ত কর্তব্য। ভারতচন্দ্রের সময়কালে বাংলা কাব্যের গতি ধারায় 'চৌরপঞ্চাশিকা' একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১ সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবৃতির জন্য আমি নির্ভর করেছি পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'সংস্কৃত কাব্যধারা' গ্রন্থের ওপর। উক্ত গ্রন্থে প্রাচীন কাল থেকে ১২০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সংস্কৃতের উদাহরণ সঙ্কলিত হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের আরম্ভে সাংকৃত্যায়নের ভূমিকা আছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন কিতাব মহল, ইলাহাবাদ, বম্বই, দিল্লী, ১৯৫৮

২ তদেব।

৩ 'রাজতরঙ্গিনী'র সপ্তম তরঙ্গের ৯৩৭ শ্লোকে বিল্‌হনের উল্লেখ আছে। Rajatarangini : Sahitya AKADEMI, New Delhi, 1968

৪ 'রাজতরঙ্গিনী'র সপ্তম তরঙ্গের ২৩১, ৫০৬ এবং ৭২৩ শ্লোকে রাজা কলশের উল্লেখ আছে।

৫ সংস্কৃত একটি শ্লোকের উদাহরণ ঃ

"অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরোং
ফুল্লারবিন্দবদনাং নবরোমরাজীম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বলমাল সাংগীং
বিদ্যাং প্রমাদ গলিতাশিব চিন্তাযামি ॥"

৬ 'অন্নদামঙ্গল'. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৭০-২৭২

৭ The Pictures of 'The Chaurapanchasika : A Sanskrit love Lyric : Leela Shiveswarker : The National museum, New Delhi, 1967

৮ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

৯ ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ : শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৪৭

চৌরপঞ্চাশিকা : অনুবাদ

১

অদ্যাপি হায় তার কথা ভেবে
　　বেদনাবিধুর চিত্ত—
স্বর্ণচাঁপার মাল্য গলায়
　　যেন উজ্জ্বল চিত্ত।
পদ্মপ্রসূন মুখকান্তির
　　বিমল ভাতির গর্ব
উত্তমাঙ্গ তরঙ্গ হয়ে
　　কটিদেশে হয় খর্ব।
প্রেমাকাঙ্ক্ষায় শরীরটি তার
　　উচ্ছল মৃদু কাঁপছে
নিদ্রাভঙ্গে প্রেয়সী রমণী
　　রতিসুখ সাধ মাগ্‌ছে।

২

অদ্যাপি হায় যদি পুনরায়
　　দেখি সে রমণীরত্ন,
পূর্ণচন্দ্র মুখকান্তির
　　শোভা অতুলন যত্ন।
পীনপয়োধরা প্রেয়সী আমার
　　কামনাপ্রভার দীপ্তি
তখনই স্নিগ্ধ হবে তার বাহু
　　রতিতে যখন তৃপ্তি।

৩

অদ্যাপি হায় যদি পুনরায়
　　দেখি সে রমণী কান্তি।
পদ্মলোচনা লীলায়িতা নারী
　　তনু দেহে আনে শান্তি,

বক্ষের ভারে নুয়ে পড়ে দেহ
দু বাহুতে নিতে চাই।
ওষ্ঠপুটের মধুক্ষরণ
চুম্বনে যেন পাই।

৪

অদ্যাপি হায় স্মৃতিতে মধুর
রতিতে ক্লান্ত নারী,
ভৃঙ্গ তুলন ক্ষীণ কটি তার
আমি কি ভুলতে পারি?
কেশগুচ্ছের অতুলন শোভা
ঢাকে সব গোপনতা
কোমল দুবাহু আমার কণ্ঠে
যেনবা স্বর্ণলতা।

৫

অদ্যাপি হায় স্মরণে রেখেছি
উজ্জ্বল দুটি আঁখি।
প্রেম-প্রহরায় চঞ্চল যেন
দুইটি ত্রস্ত পাখী।
প্রেমের সায়রে সে যেন হংসী
স্রোতবিভঙ্গে কাঁপে,
উষালগ্নের প্রথম প্রহরে
আনন্দক্ষণ যাপে।

৬

অদ্যাপি যদি দেখি সেই নারী
বিরহেতে উদাসিনী,
ব্যাকুল বিবশা আলুলিত কেশা
বিনম্রা পদ্মিনী,
বাহুডোরে তারে বন্দিনী করে
বক্ষে লব যে টানি
এবং তাহলে বিরহের দিন
আর আসবেনা জানি।

৭

অদ্যাপি হায় স্মৃতিতে মধুর
　　আবেশের রাশ টানি
চাঁদের মতন মসৃণ তার
　　দেহ-লাবণ্য মানি
করির কুম্ভ নিতম্ব যার
　　সেই মনোহর প্রিয়া
নৃত্যের তালে প্রেমের অর্ঘে
　　ব্যাকুলিত হল হিয়া।

৮

অদ্যাপি হায় মনে পড়ে যায়
　　শয্যা-শায়িতা বধূ
প্রসারিত যার অঙ্গ-মাধুরী
　　দেহ-স্বাদে যার মধু।
কামনায় সে-যে অনঙ্গ-প্রিয়া
　　আসঙ্গে কাম-রতি।
স্বেদ-সঞ্চারী শরীরে তাহার
　　বসনের বিচ্যুতি।
সুগন্ধ-তনু মৃগনাভি যেন
　　হয়তো বা চন্দন
দুই দেহ মিলে মিলন রভসে
　　আশ্লেষে বন্ধন।

৯

অদ্যাপি হায় মনে পড়ে যায়
　　ওষ্ঠ মদিরা মাখা।
কুরঙ্গসম দীর্ঘ নয়ন
　　হস্তে পুষ্প শাখা।
কেতকী-কেশরে সুরভিত কেশ
　　অগুরু গন্ধ দেহে,

দ্রাক্ষা-আসব পান করে নারী
নয়ন বিনত স্নেহে।
লবঙ্গ আর কর্পূর দিয়ে
তাম্বুলে অভিলাষ,
এ-নায়িকা নারী সর্বকালের
প্রণয়ের আশ্বাস।

১০

অদ্যাপি হায় মনে পড়ে যায়
কোমলাঙ্গিনী প্রেয়সী,
ঋতুবল্লভা নায়িকা রমণী
স্বেদমুক্তায় শ্রেয়সী।
করতলে তার কপোল ন্যস্ত
প্রসারিত বামজানু
পুষ্পস্বরূপা রমণী রত্ন
প্রথম উষার ভানু।
যৌবনবতী লাবণ্যময়ী
দিব্য সুদর্শনা
অলক্তরাগ পদতলে তার
সুমোহিনী অঙ্গনা।

১১

অদ্যাপি হায় নিশীথ রাতের
সে-ঘটনা পড়ে মনে,
রতিতে ক্লান্ত প্রেয়সী যখন
নিদ্রায় ক্ষণে ক্ষণে
চমকিত হয়ে হেসে উঠে আর
বলে শুধু 'জীও জীও',
কর্ণাভরণ মৃদু সংরাগে
সাড়া দেয় 'প্রিয় প্রিয়'।

১২

অদ্যাপি আমি স্মরণে রেখেছি
মুখশোভা দয়িতার
বিপরীত রতি ইচ্ছায় যবে
সমস্ত দেহভার
ন্যস্ত করলো আমার বক্ষে
কাঁপলো কানের দুল
প্রবল বাতাসে যেভাবে হঠাৎ
শিহরায় বনফুল।
দোলায়িত তনু বঙ্কিম গ্রীবা
আশ্লেষ মোহমধু
দ্রুত নিশ্বাসে আলুলিতকেশা
দিব্যাঙ্গনা বধূ।

১৩

অদ্যাপি হায় বিম্বাধরার
শুভ্র চপল হাসি,
অমৃতের চেয়ে মধুর যেনবা
যেনবা পুষ্পরাশি।
কামনা-প্রসূত মৃদু বাক্যের
অবিরল ঝঙ্কার
স্মরণেরে করে বরণীয় আর
কাম্য চমৎকার।

১৪

অদ্যাপি হায় মনে পড়ে যায়
লজ্জিত বধূমুখ।
কোমল গন্ডে রক্তপ্রলেপ
অরুণিমা উৎসুক।
আমার নেত্রে নিশ্চল হয়ে
সে-দিনের ছবি ভাসে
যে দিন প্রেয়সী কুণ্ঠিতবাক
লজ্জানম্র হাসে।

১৫

অদ্যাপি হায় মনে পড়ে যায়
চন্দনচর্চিত
উরুতে তাহার নখ-চিহ্নের
রেখালিপি অঙ্কিত।
স্বর্ণখচিত গাত্রাবরণ
টেনে নিই আমি খুলে,
বুকের কুসুম দিশাহারা হয়ে
কাঁপে যেন সব ভুলে।

১৬

অদ্যাপি আমি গোপনে গোপনে
স্মরণ করছি হায়,
কজ্জলমাখা নয়ন তাহার
ঢুলু ঢুলু মদিরায়—
সুরভিত তনু, কেশপাশ আর
অধরের রঞ্জন।
দাঁতের পংক্তি মুক্তার মতো,
বলয়ের শিঞ্জণ।

১৭

অদ্যাপি আমি স্মরণ করছি
সর্পিল বেণী কেশে
এবং কণ্ঠে গজমতি মালা
অপূর্ব শোভা বেশে।
হাস্যদীপ্ত মাধুর্যমাখা
ওষ্ঠ দুইটি তার
উন্নত দুটি বক্ষের শোভা
কনক-কটোরা যার।

১৮

অদ্যাপি আমি স্মরণ করছি
সে রাতের অভিসার

প্রদীপের আলো ক্রমে দূর করে
　　নিশার অন্ধকার,—
কক্ষে তাহার গোপনে লুকায়ে
　　দেখি তার বরদেহ
সুগন্ধ তনু অনুভবে আসে
　　হৃদয়েতে প্রেম স্নেহ।

১৯

অদ্যাপি আমি স্মরণ করছি
　　সারা দিনমান ধরে—
না দেখলে তারে আমার সময়
　　কাটবে কেমন করে ?
কৃশতনু তার লঘু পদভার
　　মৃগশোভা আঁখি যার
বিরহে ব্যাকুলা রমণীর দেহ
　　কেঁপে ওঠে বারবার।

২০

অদ্যাপি আমি স্মরণ করছি
　　হাস্য-সলাজ নারী
পয়োধর ভারে আনত তাহারে
　　আমি কি ভুলতে পারি ?
কম্পিত দুটি বুকের কুসুম
　　মুক্তার মালা গলে
আবেগ-ত্রস্ত রতির শৃঙ্গ
　　আশ্লেষে পড়ে ঢলে।

২১

অদ্যাপি আমি স্মরণ করছি
　　কাম-মদিরার মোহ
অস্ফুট প্রেম-সংলাপে যবে
　　হৃদয়েতে সম্মোহ—

রমণী তখন বিহ্বল তনু
শৃঙ্গারে সকাতর
শব্দ তখন অর্থবিহীন
যুক্তি অনাদর।

২২

অদ্যাপি আমি স্মরণ করছি
শ্রান্ত রমণী দেহ,
রতি-সঙ্গমে আতুর প্রেয়সী
নয়নে নিমীল স্নেহ।
আলুলিত কেশ মস্তক শোভা
বেশবাস বিচলিত
রভসে ক্লান্ত রমণীশরীর
আশ্লেষে বিগলিত।

২৩

অদ্যাপি যদি দিবসের শেষে
দর্শন লাভ করি
প্রেয়সীরে আমি অপাঙ্গে যিনি
আমারে নিয়েছে বরি—
দুর্লভ তার বক্ষ-প্রসূন
সুগন্ধে আপ্লুত—
শৌর্য প্রতাপ বর্জন করে
তার পায়ে হব নত।

২৪

অদ্যাপি আমি স্মরণ করছি
কামনা-শ্রেয়সী প্রিয়া,
বিশ্বভুবনে তার তুলনায়
নেই কোনো বরণীয়া।
পুষ্পধনুকে কাম আর রতি
যারে বিচলিত করে

শিহরিত স্নায়ু দেহ জর্জর
　　কামনা-তীক্ষ্ণ শরে।

২৫

অদ্যাপি আমি ভুলতে পারি না
　　লতায়িত বাহু তার
কণ্ঠ আমার জড়িয়ে রেখেছে
　　তার সেই দেহভার
ফুল্লকুসুম প্রজাপতি যেন
　　প্রেমময় সম্ভার।
লাজ-রাঙা মুখ সিক্ত অধর
　　গোপন অঙ্গীকার।
জীবন-মোহন, মরণ-মোহন
　　আলোর কণিকা নারী
বৈশ্বানরের তাপে জর্জর
　　কামনার অধিকারী।

২৬

অদ্যাপি আমি প্রসন্না সেই
　　কামিনীর কথা স্মরি।
সর্বপ্রথমা বামা সেই নারী
　　কি দিয়ে তাহারে বরি?
রাজার কন্যা যৌবনাতী
　　কামনার ইন্ধন
দেহশোভা যার বিশ্বমোহন
　　নিত্য চিরন্তন,
যে রাজার বালা কাতর কণ্ঠে
　　বলে, "হে আমার প্রভু
বিচ্ছেদ-জ্বালা ক্ষণকালও আমি
　　সইতে না পারি কভু!"

২৭

অদ্যাপি আমি যখন মৃত্যু
চোখের সামনে ভাসে
দেবতারে ফেলি প্রিয়ার চিন্তা
বারবার মনে আসে।
যখন কিছুই করবার নেই,
একটিই জপমালা
তখন আমার কণ্ঠে জাগছে,
"সে আমার প্রিয় বালা।"

২৮

অদ্যাপি আমি দুঃখের সাথে
স্মরণ করছি তার
মৃগাক্ষী দুটি অশ্রু সায়রে
কাঁপলো বারংবার
যখন শুনলো রাজার আদেশ
আমার মৃত্যু হবে;
অশ্রুবিন্দু মুক্তার মতো
ঝরে আঁখি পল্লবে।

২৯

অদ্যাপি আমি দৃষ্টিকে যদি
বহুদূরে মেলে চাই
চপলনেত্রা কোমলাঙ্গীর
সমতুল নাহি পাই।
সে যে অনন্যা রাজার কন্যা
পুষ্প-পেলব তনু
বৃষ্টিধৌত আকাশের বুকে
যেনবা ইন্দ্রধনু।
রূপের প্রভায় চন্দ্র হারায়
তার উজ্জ্বল ভাতি,
যেনবা রাহুর গ্রাসে আপতিত
সমস্ত দিন রাতি।

৩০

অদ্যাপি আমি স্মরণ করছি
কাঙ্ক্ষিত তার তনু,
কার বিচ্ছেদে বিষাক্ত হয়
সব অণুপরমাণু;
মিলনে আবার মধুক্ষরণ
জীবনের সঞ্চয়,
প্রেমাগ্নিদাহে যে রমণী হয়
শান্তির বরাভয়।

৩১

অদ্যাপি হায় স্মরণ করছি
তার সেই ব্যাকুলতা
তরবারী যবে ঝলসে উঠলো
যেন বিদ্যুল্লতা,
কৃতান্ত সম রাজার প্রহরী
আমারে বধিতে চায়
প্রেয়সী তখন দুঃখে আতুর
মূর্চ্ছিত হতাশায়।

৩২

অদ্যাপি আমি চিত্তদাহনে
নিপীড়িত দিবারাতি
আর আমি কভু দেখবোনা হায়
তার প্রিয় মুখভাতি।
যে মুখের শোভা পূর্ণচাঁদের
শোভাকে খর্ব করে
সে প্রমদা নারী বিদ্ধ করেছে
চিত্ত প্রেমের কারে।

৩৩

অদ্যাপি হায় আমার চিত্ত
তার ধ্যানে বিহ্বল---

একদা যে নারী মুক্ত করিয়া
তার বসনাঞ্চল
দয়িতকে করে দুর্বল আর
কামানলে জর্জর
সে-নারীর ধ্যানে আমার চিত্ত
ব্যাকুলিত সকাতর।

৩৪

অদ্যাপি হায় শ্রুতিসুখকর
সময়ের শিঞ্জন
এবং তাহার পদযুগলের
নূপুরের নিক্কন।
মনে পড়ে যায় মৌমাছিগুলো
পদ্মকোরক সম
ওষ্ঠের পানে ছুটে যায় তার
যে আমার প্রিয়তম।

৩৫

অদ্যাপি হায় মনে পড়ে যায়
তাঁর উল্লাস-রতি
তার অধরের চুম্বন নিয়ে
আমি বিহ্বল অতি।
পয়োধরে আঁকি নখের চিহ্ন
গোপন সম্ভাষণ
চিত্তহারিণী নায়িকা তখন
মুগ্ধা বিলক্ষণ।

৩৬

অদ্যাপি হায় মনে পড়ে যায়
তার রোষ অভিমান
বিদায় নেবার ইচ্ছায় কেন
আমারে অসম্মান।

পদযুগ ধরে আমার তখন
সকাতর প্রার্থনা,
"আমি তব দাস ক্ষমা কর মোর
বিনীত কাঙালপণা।"

৩৭

অদ্যাপি হায় সখিগণ সহ
কৌতুক মনে জাগে
কক্ষে কক্ষে কত উল্লাস
রাগ আর অনুরাগে।
নৃত্যরতার অঙ্গমাধুরী
রত্নপ্রদীপে কাঁপে
চপলনেত্রা কোমলাঙ্গিনী
মিলনের ক্ষণ যাপে।

৩৮

অদ্যাপি আমি জানিনাক হায়
সে কি শিব-সঙ্গিনী ?
ইন্দ্রের শাপভ্রষ্টা কামিনী
মধুরাগ রঙ্গিনী ?
রাধিকা-রমণ কৃষ্ণের প্রিয়া
রূপবতী যৌবনা
ব্রহ্মার বরে সৃষ্টি হয়েছে
আবেশে অন্যমনা ?

৩৯

অদ্যাপি কভু বিমল ভাতির
তার মনোহর দেহ
আঁকতে পারেনি তুলি সংরাগে
পৃথিবীতে কভু কেহ
কল্পলোকের রমণীরত্ন
দেব-বল্লভা যিনি

সে আমার প্রিয়া অতি অনন্যা
মাধুর্যে বিমোহিনী।

৪০

অদ্যাপি দেখি দৃষ্টি সুখদ
মোহন আনন তার
শশাঙ্ক সম মুখমণ্ডল
গলে গজমোতি হার ;
মুনিরা সবাই ধ্যান ভেঙে তার
পদতলে অবনত
আমার চিত্ত বিহ্বল হয়ে
তার ইচ্ছায় গত।

৪১

অদ্যাপি আমি প্রেমের জন্য
প্রাণ দিতে অভিলাষী
যে-প্রেম বিশ্বে তুলনারহিত
যেই প্রেম অবিনাশী।
প্রেমের দেবতা পরাভূত হয়
আমার প্রেমের কাছে
সকল বেদনা বহন করার
শক্তি আমার আছে।

৪২

অদ্যাপি আমি ফিরে পেতে চাই
প্রেমের বদান্যতা
যে প্রেম মধুর কুবলয়রেণু
ফুলে ফুলে সখ্যতা।
যে প্রেম সদাই উদার বচন
চিত্তের বিনোদন
যে প্রেম জীবনে প্রাণদ কুসুম
শুভ অভিনন্দন।

৪৩

অদ্যাপি দেখি সৌন্দর্যের
　　অপার মহিমা কত
শত বিস্ময় বিশ্বভূমায়
　　ছড়ানো ইতস্ততঃ।
কিন্তু আমার প্রত্যয় শুধু
　　একটিই আছে জেন
আমার প্রিয়ার সৌন্দর্যের
　　তুলনা নাইকো হেন।

৪৪

অদ্যাপি হায় মনে পড়ে যায়
　　রাজহংসীর মত
তার শরীরের গতি ভঙ্গিমা
　　যৌবনে অবিরত
আমার মনের নদীর গভীরে
　　ভেসে চলে আরবার
সে এক জীবন মধুর জীবন
　　দীপ্ত চমৎকার।

৪৫

অদ্যাপি আমি স্মরণ করছি
　　চিন্তামলিন ওষ্ঠ তার
মোর নিশ্চল নেত্রে দেখেই
　　বেদনাবিধুর অঙ্গ তার।
উদয়-সূর্যে রক্তিম হয়ে
　　অন্তরীক্ষ দীপ্তিমান
রক্তিম তার ওষ্ঠের তাপে
　　অরুণ কিরণ অম্লমান॥

৪৬

অদ্যাপি হায় মনে পড়ে যায়
যামিনীতে চঞ্চল
স্রস্ত বসনে তার জাগরণ
যেন চম্পকদল।
কটিদেশে তার দেবতার লীলা
যেন এক বেদীতল
অমৃতের ভারে বুকের কুম্ভ
ত্রস্ত ও চঞ্চল।

৪৭

অদ্যাপি আমি স্মরণ করছি
বিবশা ক্লান্ত দেহ
স্বর্ণ-শোভায় শোভমান আর
দৃষ্টিতে প্রেম-স্নেহ।
আমাদের প্রেম চুম্বনে মধু
প্রেমের রসামৃত
এক দেহ ছুঁয়ে অন্য শরীর
কামনায় আবৃত।

৪৮

অদ্যাপি আমি প্রেম-সংগ্রামে
রমণের হেরি লীলা
কামনা-রভসে নখরচিহ্ন
প্রেম অন্তঃশীলা।
বাহুবন্ধনে আরাধ্য রতি
দেহ-বিভঙ্গে কাঁপে
চতুরা নায়িকা প্রেম-সংরাগে
দীর্ঘ যামিনী যাপে।

৪৯

অদ্যাপি আমি তার বিচ্ছেদ
　　নিয়ত সহ্য করি
দুঃখদাহনে সময় যাপন
　　দিবা আর শর্বরী ;
এই বেদনার সমাপন কোথা ?
　　মৃত্যুতে অবসান ;
মৃত্যুকে চাই, মৃত্যু আমার
　　চির শেষ অভিমান।

৫০

অদ্যাপি জানি কূর্মপৃষ্ঠ
　　পৃথিবীর ভার বহে
তীব্র জ্বালার তীক্ষ্ণ গরল
　　শিবের কন্ঠ দহে।
বারিনিধি সদা অতি দুর্বহ
　　বাড়ব-অগ্নি বহে,
সত্যদীপ্ত মোর প্রতিজ্ঞা
　　কদাচ মিথ্যা নহে।